Vol. 39 | No. 3 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনানন্দের কাব্যভাবনা

Volume	39
Issue	3
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	অলোক রায়
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v39i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i3.1
Pages	5-15
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জীবনানন্দের কাব্যভাবনা

অলোক রায়

১৩৬১ সালে পৌষ মাসে 'কবিতা' পত্রিকায় নরেশ গুহ যখন 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নিয়ে আলোচনা করেন তখন অনেকের জানা ছিল না কবিতা নিয়ে লেখা জীবনানন্দের অসংখ্য গদ্য রচনার কথা ('কবিতার কথা' বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফাগুন ১৩৬২ সালে) আর সেই জন্যই সম্ভবত তখন সমালোচকের মনে হয়েছিল, "আমাদের জ্যেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অনেকেই প্রাবন্ধিকও। ... জীবনানন্দ শুধুই কবিতা লিখেছেন, কবিতা ছাড়া আর কিছুই লেখেননি। তাঁর যে দু-চারটি প্রবন্ধ সাময়িক পত্রের পাতায় প্রক্ষিপ্ত হয়ে আছে সে-ও একরকম কবিতাই। তাঁর কবিতারই মতো বিশেষ এক ধরনের গদ্যে লেখা।" অথচ দু-চারটি প্রবন্ধ নয়, জীবনানন্দ অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন (বিশেষ এক ধরনের গদ্যে লেখা গল্প উপন্যাসের কথা বাদই দিচ্ছি),—'কবিতার কথা' বইতে আছে ছোট-বড় পনেরোটি প্রবন্ধ। তার বাইরেও আছে আরও অনেক প্রবন্ধ, গ্রন্থসমালোচনা, কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা—পত্রসাহিত্যের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ্য। জীবনানন্দ গদ্য রচনায় অনাগ্রহী ছিলেন না, তবে গদ্য রচনা প্রকাশে ও প্রচারে হয়তো কিছুটা নিরুদ্যম। কবিতার মতো তাঁর গদ্যও নিশ্চয় এক স্বতন্ত্র রচনাশৈলীর নিদর্শন, বাক্য গঠনে সেই রকমই প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম, শব্দ নির্বাচনে (কখনও শব্দ নির্মাণে) অভিনবত্ব পদে পদে। কিন্তু তাই বলে কবির লেখা গদ্য, 'সেও একরকম কবিতাই'—এমন ভেবে তাকে প্রবন্ধ সাহিত্যের আঙিনার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা অন্যায় হবে। জীবনানন্দের গদ্যে ভাবনা কথা ও ইঙ্গিতের দুর্লভ স্বল্পতার ভিতর দিয়ে মানবসমাজকেই চিনে নেবার ও চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সেখানে বিশেষভাবে মিলবে তাঁর মনন-প্রতিভার পরিচয়। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েক লাইন উদ্ধৃতির সাহায্যে হয়তো সব সময় গদ্যকার জীবনানন্দের সবটুকু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। তবু তাঁর গদ্যশৈলী যে কতটা আত্মসচেতন এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধ তার পরিচয় মিলবে এই ধরনের পত্রাংশে—

আমাদের এই পৃথিবীর ভিতরেই আরো অনেক পৃথিবী রয়েছে যেন; সাধারণ চোখ দিয়ে স্বভাবত তা খুঁজে পাওয়া যাবে এমন নয়; থাকে তা সৃষ্টিপরায়ণ মানসের ভিতর; এরাই আমাদের দেখান। সেই সব পৃথিবীর ভিতর কোনোটা যেন এই জগতেরই তীব্র স্বচ্ছ মুকুরের মতো; কোনোটা কিছু কুয়াশাচ্ছন্ন অথবা বিদ্যুতায়িত; এই রকম এবং আরো অনেক রকম।

(সিগনেট প্রেস সমীপেষু, ৩০.১০.১৯৪৩)

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-দিব্যতা—যা নতুন শুদ্ধ সমাজ মানবকে দান করতে পারে—এই দৃষ্টি-দিব্যতার দিক থেকে তা হলে কি অতীতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই বিফল? কিংবা সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই কি অল্পাধিক সার্থকতায় অবিচ্ছিন্ন সময়ের সমবেত চেষ্টায় বিজ্ঞানশুদ্ধ শুভ্র নিঃশ্রেয়স সমাজ গড়েছে? তা হয়তো গড়ছে (এ প্রয়াসের পথে কোনো শেষ কৈবল্যলোকও নেই হয়তো) যেমন শ্রেষ্ঠ মনীষী অর্থশাস্ত্রী ও সঠিক বিশ্বয়ালোকিত সেবক ও সাধকেরা গড়ছে। (চিঠি, ২.৭.১৯৪৬)

কবি জীবনানন্দ কবিতা নিয়েই বেশি প্রবন্ধ লিখেছেন, এবং এক হিসাবে এটাই প্রত্যাশিত। আর একজন কবি যখন কবিতা নিয়ে কিছু লেখেন তখন তার মধ্যে প্রাতিস্বিক কিছু কাব্যভাবনার প্রকাশ ঘটে। জীবনানন্দের কাব্য ভাবনায় জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক সন্ধানের কথা এসেছে বারবার। কবিতাকে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন সাধনের কাজে তিনি লাগাতে চান না, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে করিয়ে দেন— "আমি বলতে চাই না যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই; সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই। কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়।" (কবিতার কথা, ১৩৪৫)। কিন্তু পাঠকের ইমাজিনেশনকে তৃপ্তি দেওয়াই কি কবির কাজ? অধিকাংশ পাঠক কবিতা ভালোবাসে না, তার কল্পনার দৌড়ও সীমাবদ্ধ, তাহলে প্রশ্ন জাগে, "যদি আরো বেশি লোকে কবিতা ভালোবাসতে ও বুঝতে শেখে তাহলে সেই অনুপাতে" সমাজের মঙ্গল হবে কি না? কবি অবশ্যই সমাজের মঙ্গল সাধনের কথা ভেবে কবিতা লেখেন না। কিন্তু তিনিও দীক্ষিত পাঠক চান। তিনিও সমাজের কথা ভাবেন, সেদিক থেকে সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষীও বটে।

জীবনানন্দ কবিতা পাঠকের কথা ভেবেছেন সত্য, পাঠকের অভাব সম্বন্ধে তাঁর মনে এক ধরনের আক্ষেপও ছিল ("সাহিত্যের বড় বাজারে আমার কবিতা কাটে বলে মনে হয় না; তবে যে বাজারে কাটে সেখানে গ্রহীতার সংখ্যা বরং কম।"—চিঠি, ২৬.১২.১৯৪৫)। কিন্তু পাঠকের দিক থেকে ততটা নয়, যতটা কবি হিসাবে তিনি কাব্য সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যায় আগ্রহ বোধ করেছেন। অনেক সময় তাঁর মনে হয়েছে কবিতা লেখাই তাঁর প্রধান কাজ, কবিতা বা কাব্যতত্ত্বের প্রবন্ধ-ব্যাখ্যা লিখে সময়ের অপব্যবহার না করাই কাম্য—"কবি যদি কিছু লিখতে চায় তাহলে কাব্য এমন কি নিজের কবিতা সম্বন্ধেও পাঠকের খটকা ঘোচাবার দরকারে পরিষ্কার গদ্য আলোচনা লেখার চেয়েও অস্পষ্ট (তার পাঠকদের মতে)

কবিতা লিখতেই ভালোবাসে বেশি: কবিতা লেখা চাই: প্রবন্ধ হয়তো পরে লেখা হবে; অথবা প্রবন্ধে কোনোদিন হাত দেওয়া হবে না হয়তো। কিন্তু লোকে যদি কবির কবিতার কোনো সঙ্গতি ধরতে না পেরে ব্যাহত হতে থাকে তাহলেও নিজের বিবেকের কাছে খাঁটি থেকে নতুন কবিতা লিখতে (অর্থনৈতিক পীড়নে ক্লান্তি না হয়ে পড়লে) নিরুৎসাহ বোধ করে না কবি; বিবেক তা উপলব্ধির কোথাও কোনো ছিদ্র আছে কি না বিচার করে দেখে, ভুল শোধরায়, বিশুদ্ধ করে, পুনরায় কবিতা লিখতে চেষ্টা করে।" (কবিতার আলোচনা, ১৩৫৬)। কবিরা কাব্য ব্যাখ্যায় প্রণোদিত হলে কার লাভ—এ নিয়ে বিতর্ক থাকা সম্ভব। শুধু পাঠকদের কথা ভেবেই কি কবি কাব্যসৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে অগ্রসর হন, অথবা অন্য কবিকে সাহায্য করার একটা সুপ্ত ইচ্ছা তাঁর মনের মধ্যে কাজ করে। এমনও তো হতে পারে কবি নিজের জন্যই লেখেন এইসব প্রবন্ধ, নিজের কাছে নিজে স্পষ্ট হওয়ার জন্যে। আমরা জানি রোমান্টিক কোলরিজ বা আধুনিক এলিয়ট কবিতার সঙ্গে প্রবন্ধও লিখেছেন, তাঁদের আলোচনা পড়ে শুধু সাধারণ পাঠক নয়, কবিরাও কখনো উপকৃত হয়েছেন। তবু জীবনানন্দের মনে একটা সংশয় থেকে যায়—"কবিদের চিন্তা স্বভাব প্রায়ই এই যে কবিতার আলোচনা লেখা অনুভূতি শিক্ষা ও নিরীক্ষায় পারদর্শী সমালোচকের কাজ; কবিতা লেখা কবির কাজ; সমালোচনাও সে লিখতে পারে, কিন্তু সে জিনিস প্রথম আকর্ষণ ও ভালোবাসায় খুব সম্ভব লেখা হয় না—প্রাথমিক দায়িত্ববোধে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে (সকলের বেলা নয়) হয়তো লেখা হতে পারে।" কবি নন, এমন ব্যক্তি, জীবনানন্দ যাঁদের 'নিষ্কবি গদ্য-সমালোচক' বলেন, তাঁরাও কবিতা ব্যাখ্যায় আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবু কবি যে-কথা যেমন ভাবে বলতে পারেন, তা কি অন্য কারো পক্ষে সম্ভব? আর এই আগের কথার প্রতিবাদ করে কয়েক লাইন পরেই তিনি লেখেন—"কিন্তু তবুও কবিতা সম্বন্ধে বড়, সত্যার্থী আলোচনা কবিদেরই করা উচিত—সৎ কবিদেরই নিজেদের অনুভূতি ও চিন্তার কবিতাত্মক প্রয়োগ থেকে তাদের খুলে নিয়ে অন্য প্রয়োগে—কবিতা সম্পর্কে আলোচনায়— মাঝে মাঝে নিয়োজিত করা দরকার। কোনো ভালো কবির কোনো একটি কবিতার বই কিংবা এদেশের আধুনিক কালের কবিতা অথবা এমনি মোটামুটি কাব্য সম্বন্ধে বড় কবিরা যদি সময় করে স্থিত, শুদ্ধ হয়ে দল ও বন্ধুত্বের ব্যাস থেকে মুক্ত, যথাসম্ভব স্বচ্ছ ও ধ্যানসাধ্য প্রবন্ধ লেখেন তাহলে সে সব লেখায় আশা করা যায় পাণ্ডিত্যের চেয়ে জ্ঞান বেশি থাকবে। পাণ্ডিত্যে অর্ধসত্য ঢের, জ্ঞান সত্যের বেশি নিকটে; পাণ্ডিত্যের চেয়ে জ্ঞান পরিচ্ছন্ন। লাভ হবে অন্য কবিদের, কবিতা পাঠকদেরও।" আমরা দেখেছি, কোনো একটি কবিতার বই নিয়ে জীবনানন্দ যেমন আলোচনা করেছেন (বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী') তেমনি আধুনিক কালের কবিতা নিয়ে

লিখেছেন কয়েকটি প্রবন্ধ (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, উত্তররৈবিক বাংলা কবিতা, আধুনিক কবিতা, অসমাপ্ত আলোচনা) সেই সঙ্গে 'মোটামুটি কাব্য' সম্বন্ধে লিখেছেন ধ্যানসাধ্য কিছু প্রবন্ধ যাকে কাব্যতত্ত্ব রচনার প্রয়াস বললে ভুল হবে না (কবিতার কথা, মাত্রা চেতনা, কবিতা প্রসঙ্গে, কবিতার আত্মা ও শরীর, কি হিসাবে শাশ্বত, দেশ কাল ও কবিতা, সত্য বিশ্বাস ও কবিতা, রুচি বিকার ও অন্যান্য কথা, কবিতার আলোচনা)।

জীবনানন্দ কোনো নতুন কাব্যতত্ত্বের অবতারণা করেননি। সাধারণভাবে রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন, তবে তাকে নতুন কালের প্রয়োজন মতো, হয়তো নিজের ভাব প্রতিভার অনুকূল এমন এক তাৎপর্য দিয়েছেন যাকে উত্তররৈবিক তথা উত্তররোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের প্রস্তাবনা বলে মনে হয়। শাশ্বত কাব্য সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা ধারণা ছিল—মহাভারত, হোমার, দান্তে, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ অমর ও অবিস্মরণীয়, কারণ "উপলব্ধি প্রকাশের অদ্বিতীয় পদ্ধতি—যা আদি আধার ও আধারের মিলনীদেশের অনির্বচনীয় সত্যেরই সামিল প্রায়— সে রকম দান হিসেবে" তাঁদের কাব্য বেঁচে আছে। অন্যদিকে শেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথ আরও অনেকদিন আধার ও আধেয়ের একটি অবিনাশ সত্যস্বরূপের অনির্বচনীয়তায় অমর হয়ে থাকবেন, "কিন্তু সময় বয়ে চলেছে; আমরা সে সব জানব না কিন্তু সে জানবে-সাহিত্যে মৃত্যু অমরতা ও পুনঃপ্রবাহের আরো কোনো নতুন নিয়ম আছে কি না, কিংবা যে-সব নিয়ম শৃঙ্খলা রয়ে গেছে সেগুলোর স্বতঃসিদ্ধতা সঠিকভাবে স্থির করা হল কি না।" (কি হিসেবে শাশ্বত, ১৩৫৫)। কবি সত্যসন্ধানী, অথবা কাব্য সত্যের সন্ধান দেয় বলেই তা শাশ্বত, এমন কি সেখানে অর্ধসত্যের সন্ধান মিললেও তা মূল্যবান। কিন্তু মহাভারত বা দান্তে অমরতার স্বীকৃতি নিয়েও পঠিত হচ্ছে না—একদিন যা ছিল শাশ্বত, সময় তাকে ভেঙে ফেলেছে, যেহেতু আমরা "সময়ের সেতু পার হতে চাই তারি ভিতর থেকে উৎসারিত আমাদের শতাব্দীর ও জীবনের প্রয়োজনে স্থিরতর আধুনিকের অপরিহার্য স্পষ্টতর সব সম্বন্ধে-শৃঙ্খলের পথে।" রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন, যে-ভাবে লিখেছেন, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তা নয়। তবে সেই সঙ্গে স্বীকার্য "দু-একজন কবির কিছু কিছু কবিতা ছাড়া আধুনিক বাংলা কবিতায় ভঙ্গুরতার ছাপ এমন দেদীপ্যমান যে মুহূর্তের জন্যেও রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো কবিতা বা গানের সংস্পর্শে এলে মনে হয় তাঁর সঙ্গে আধুনিকদের আদর্শগত বিসদৃশ্যতা কী ভয়াবহ ভাবে চমৎকার! আমাদের দিক থেকে এই বিষয়ানুপাতিক গতির প্রয়োজন ছিল বললেই চলবে না, বর্তমান সমাজ ও ইতিহাসের দিক দিয়ে এ বিষমতা দুরতিক্রম্য হয়ে উঠেছে— কোনো মৃদুকম্পিত আধুনিকও তা এড়াতে পেরেছে বলে মনে হয়

না।" (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ১৩৪৮)। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিচ্ছেদ তাই স্বীকার করতেই হয়। তথাকথিত আধুনিক কবিতার সমর্থনেও বলতে হয় অনেক কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা দ্বিধা কোথাও থেকে যায়—"রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে সচেতনভাবে মুক্তির জন্যে যে বিপ্লব চলেছিল কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে বাংলা কবিতায়—তা এখন একদল জ্যেষ্ঠ কবিদের ভিতরে অবচেতন লোকে বিদ্রোহের মূর্তি ধরেছে, রবি কাব্যলোকের বিপক্ষে ঠিক নয়, কিন্তু রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্য স্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে। এটাকে বিদ্রোহও ঠিক বলা চলে না, কেননা সময় নিজেই কবি সার্বভৌমিক এমন একটি দৈগন্তিক মহত্ত্বের ভিতর সরিয়ে নিয়ে গেছে যে তাঁর সম্পর্কে বিদ্রোহের প্রশ্ন এখন অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।" (উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, ১৩৫২)।

দু-ধরনের আধুনিকতার কথা কখনো বলেন জীবনানন্দ। —'সব সময়ের জন্যই আধুনিক' আর 'নিজের যুগের স্থূল সব লক্ষণে অতিরিক্ত সংক্রামিত হয়ে ... আধুনিক'। কিন্তু নিজের যুগকে ধরাতো সহজ নয়, যদি না অনেক বড় সময়সাপেক্ষ ইতিহাসকে ধরা সম্ভব হয়। অতীতে কবির ছিল একটা পরিচ্ছন্ন বিশ্বাসভূমি। এ কালের আধুনিক কবিতা আজ পর্যন্ত তেমন কোনো বিশ্বাসের প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। তাই 'অন্তর্নিঃসহায়তা' কবিকে ভরসার পথ দেখাতে পারে না। জীবনানন্দের নিজের কবিতার বিরুদ্ধে এক সময় 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'র অভিযোগ উঠেছিল। জীবনানন্দ শুধু অভিযোগ অস্বীকার করেন তাই নয়, তিনি এই সূত্রে আরোপিত আশাবাদী মনোভাবের নিষ্ফলতার কথাও বলেন— "সে মনোভাব আশাবাদী হতে পারে, কিন্তু তা আরোপিত ও আড়ষ্ট—স্বাভাবিক ও সার্বজনীন নয়। 'প্রচুর হয়েছে শস্য, কেটে গেছে ভয়' বালভাষিত, কিন্তু কবিতা নয়; শস্য প্রচুর হলেই যে 'মরণের ভয়' কেটে যায় না আজকের এই জটিল শতাব্দীর শিশুকে এ-কথা [কে] বোঝাবে?" অন্যদিকে "জ্ঞান-বিজ্ঞানালয়ের প্রাচুর্য আজকাল অনেক। ওরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মালিক। কবি তা জানেন। নিজেও সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মেনেই চলে; না হলে সে কবি হিসাবে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু এ বিজ্ঞান প্লাকার্ড-মারা বড় বড় সাইনবোর্ড-টানানো ফলিত বিজ্ঞানের নগরীর থেকে গৃহীত হয় না-এ বিজ্ঞানকে ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতির গতিপরিণতির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে স্থির করতে হয়েছে কবিমানসের ভিতর; আমি বলেছি কবি মানসের ভিতর; সাধারণ যুক্তিবাদী মনের ভিতর উপরোক্ত গতিপরিণতির ধারা স্থিরীকৃত হয় ক্রমপরিণত জ্ঞান বিজ্ঞানে—সমর্থন পায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলনে; কিন্তু এই অন্যরূপ মানসের সম্পর্কে এসে তা হয়ে ওঠে কবিতা. সমর্থন পায় এ উজ্জ্বল কবিদৃষ্টির উৎসারণে।" (আলোচনা, পূর্বাশা, আষাঢ় ১৩৫৩)। এখানে আশাবাদ-নিরাশাবাদ বড় কথা নয়, যদিও

জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনার আলোচনায় আশাবাদের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আপাতত বিচার্য, কবিতায় 'ভাবপ্রতিভা' আর 'বৈজ্ঞানিক চেতনা'র আপেক্ষিত গুরুত্ব নির্ণয়। জীবনানন্দ দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখেন না, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথও দেখতেন না।

এই খানেই রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের উপস্থাপনে কবির দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব। কবিতা রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রায় একই ভাষায় (প্রথমে চিঠিতে পৌষ ১৩৫২, পরে প্রবন্ধে কার্তিত ১৩৫৩) জীবনানন্দ একাধিকবার জানিয়েছেন, "যখনই 'ভারাক্রান্ত' হই সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোশাকে ততটা ভেবে নিতে পারি না, যতটা অনুভব করি— একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি। কবিতা লিখতে হলে ইমাজিনেশনের দরকার; এই অনুশীলনের। ... কিন্তু ভাবপ্রতিভাজাত এই অন্তঃপ্রেরণাও সব নয়। তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত শুনতে হবে; এই জিনিস ইতিহাস চেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই।" (কবিতা প্রসঙ্গে, ১৩৫৩)। প্লেটো থেকে কোলরিজ সকলেই নানাভাবে, হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে, কল্পনাপ্রতিভা ও অন্তঃপ্রেরণার কথা বলেছেন। কোলরিজ যাকে 'পোয়েটিক জিনিয়াস' বলেছেন, জীবনানন্দ তাকেই 'ভাবপ্রতিভা' বলেছেন। আর কবি কেমন করে বিচিত্র বিরুদ্ধ বিমিশ্র ভাবকে ঐক্য দান করেন, তা নিয়ে কোলরিজের মতো জীবনানন্দও ভেবেছেন। "মহৎ কবিতা জ্ঞানে গভীর নয় শুধু, অথবা প্রাকৃত জীবনের ব্যাপার নিয়ে নিবিড় নয় কেবল মাত্র; কিন্তু এই দুই জিনিস মিলে এক হয়ে গেছে সেখানে এমনই আত্মিক নিবিড়তায় ও গাণিতিক শুদ্ধতায় যে সহসা মনে হতে পারে যে মিলনোৎপন্ন কবিতা জ্ঞান নয় আর, জীবনও নয় যেন, জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল জিনিস; কিংবা জীবনকে কোনো আলাদা জগতে নিয়ে তাকে নতুন করে সৃষ্টি।" (কবিতার আলোচনা, ১৩৫৬)। কোলরিজের 'কল্পনা'-তত্ত্বের মধ্যে অনুরূপ ঐক্যবন্ধনের কথা পাই—

Imagination ... reveals itself in the balance or reconciliation of opposite or discordant qualities : of sameness with difference; of the general, with the concrete; the idea with the image; the individual, with the representative; the sense of novelty and of freshness, with old and familiar objects; a more than usual state of emotion, with more than usual order; judgement ever awake and steady self-possession, with enthusiasm and feeling profound or vehement; and while it blends and harmonizes the natural and the

artificial, still subordinates art to nature; the manner to manner; and our admiration of the poet to our sympathy with the poetry.

লক্ষণীয়, আধুনিক কবি ও সমালোচকেরা (যেমন এলিয়ট বা আই. এ. রিচার্ডস) নানাভাবে এই উক্তিটি একালে ব্যবহার করেছেন, জীবনানন্দ হয়তো সে সব রচনার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কোলরিজকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করাও জীবনানন্দের পক্ষে সম্ভব ছিল না, অন্তত 'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা' কবিকে যে 'ইতিহাসের দিক-নির্ণয় সত্তা' দান করেছে, তা ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজের 'রীজন' থেকে স্বতন্ত্র বস্তু। কিরণসঙ্কর সেনগুপ্তের কোনো একটি কবিতা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ এক সময় লেখেন, "আবেগের আন্তরিকতা অনেকেই বোধ করেন; কিন্তু হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার যে স্বতন্ত্র সারবত্তা তাকে কাব্যে পরিণত করে, আমার মনে হয় এ কবিতাটির ভিতর সে সবের প্রায় সম্পূর্ণ সফলতা আমি ছাড়া আরো কেউ কেউ অনুভব করতে পারবেন।"(কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'স্বপ্ন কামনা' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫)। শুধু কল্পনা নয়, আবেগের আন্তরিকতাও নয়, তার মধ্যে নিহিত ভাবপ্রতিভা তথা প্রজ্ঞাদৃষ্টির কথা বারবার বলেন জীবনানন্দ। এখানেই প্রকাশ পেয়েছে কবির আত্মজিজ্ঞাসা, "সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কবিতা চেতনা হয়তো দেখিয়েছে, আরো বড় চেতনার উত্তরপ্রবেশ চেয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানদৃষ্টি কি পেয়েছে যা সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে? কিন্তু কোন্ কবি তাঁর কবিতায় সেই অমোঘ 'বিজ্ঞানদৃষ্টি'র প্রভাবে সমাজ ও পৃথিবীকে নতুন পথ দেখিয়েছে-কবি-লক্ষিত সেই পথ বেয়ে মানুষ তার প্রাণের আকাঙিক্ষত সমাজ পেয়েছে? প্রয়াণের প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজো আমরা যে সমাজ পাইনি।" (চিঠি, ২.৭.১৯৪৩)। জীবনানন্দের ইতিহাসচিন্তার স্বরূপ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু কবি যে 'বিজ্ঞানদৃষ্টি'র সন্ধান করেছেন তা সর্বদা 'আশাবাদী' না হলেও প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচায়ক, আর তাই তাঁর কাছে "বিজ্ঞানের, বা অন্য কোনো অনুভূতি বা সত্যের, সিদ্ধান্ত কবির নিকটে সৎ মনে হলে যে বিশ্বাসে স্থিত হয়ে কবিতা লেখা সম্ভব তার অভাবেও, ভালো-এমন কি মহৎ কবিতা রচিত হতে পারে –অবিশ্বাস বা অনিশ্চয়তার ভিতরে বিষয়ের মাহাত্ম্য রয়েছে বলে নয়– কিন্তু যে-কোনো বিষয়-এমনকি অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসও–বিশেষ কবির হাতে শিল্পের সিদ্ধি লাভ করতে পারে বলে।" (আধুনিক কবিতা, ১৩৫৭)। অবশ্য কবি 'ভরসার পথ' খোঁজেন, জীবনানন্দও খুঁজেছেন। পঞ্চাশের দশকে, কিংবা তার কিছু আগে, তাঁর কবিতায় এবং কাব্যভাবনায় একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।– "জানু ভেঙে পড়ে গেলে হাত কিছুক্ষণ আশাশীল/

হয়ে কিছু চায়–কিছু খোঁজে; এ ছাড়া আকাশ আর নেই।" খুঁজলেই যে সন্ধান মেলে এমন নয়, আসলে বিষয়াশ্রয়িতার বিপদ সম্বন্ধে তিনি অবহিত। কিন্তু শেষ কথা অভিজ্ঞতার সততা– "শোষিত মানবজীবনের সেই জীবনোৎসারিত বিপ্লবের ও সেই বিপ্লবের শেষে আশাভরসার সমাজের কবিতা ছাড়াও আরো অনেক কিছু নিয়েই কবিতা মহৎ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সমস্ত কাজও সময়, দেশ, প্রকৃতি ও প্রেমের ঐকান্তিক জিনিস হয়েও কেবলি শ্রুয়মান, ধ্যেয়মান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন ও অভিজ্ঞ; –ও এই অভিজ্ঞতা–এই সুজাতার থেকেই উৎসারিত।" (কেন লিখি, মাঘ ১৩৫০)

তাহলে কবিতা লেখার জন্য প্রয়োজন সচেতন জীবনদর্শী মন ও সেই মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করবার মতো লিপিকুশলতা। দুটোই সমান প্রয়োজনীয়-তাই উৎকৃষ্ট সামঞ্জস্যের কথা বলেন জীবনানন্দ, "এই দুটো জিনিসের উৎকৃষ্ট সামঞ্জস্যে যে সুলিপি প্রবর্তিত হয় কবিতা কি তা' ছাড়া অন্য কিছু? আমার মনে হয় এই সুলিপি সত্যই খুব ভালো জিনিস। কিন্তু সুসমাচারের মতো এই সুলিপি-এই সমস্ত জিনিসকেই অবান্তর করে দিয়ে কবিতা নিজের চরিত্রবলে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। পূর্বজ করিয়া একে মনে করতে মায়াবল। অতটা সাহস আমার নেই। আমি একে কবিতার চরিত্রবল বলে অভিহিত করেছি।" (কেন লিখি)। এখানেও রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব থেকে কিছুটা সরে এসেছেন আধুনিক কবি-অন্তঃপ্রেরণাই সব নয়– "তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত শুনতে হবে; এ জিনিস ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই। এই সব কারণেই –আমার পক্ষে অন্তত–ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপারে নয়; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে। কোনো-কোনো সময় কাঠামোটি, এমনকি সম্পূর্ণ কবিতাটিও খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে প্রায়। কিন্তু তারপর-প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে

বেশি স্পষ্টভাবে-চারদিককার প্রতিবেশচেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কেয় আবির্ভাবে, কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায়; পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে। এরকম অঙ্গাঙ্গিযোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে।" (কবিতা প্রসঙ্গে) এই অঙ্গাঙ্গিযোগের প্রয়োজনেই কবিকে কাব্যভাষা ও কাব্যছন্দ নিয়ে ভাবতে হয়। সার্বজনীনতা লাভ করতে চায় কবিতা, কিন্তু কবিতো সাংবাদিক নন, অর্থ-রাজনীতিকও নন। কবিতার ভাষা তাই সর্বজনবোধ্য হয়েও প্রাত্যহিক ব্যবহারে ক্লিষ্ট ও প্রত্যক্ষ নয়। এইখানেই আধুনিক কবির সংশয়, হয়তো স্ববিরোধ। একদিকে "তার কথা আলাপের পর্যায়ে উঠে, ভাষায় তরঙ্গায়িত হয়ে অসাধারণ হয়ে উঠলেও স্পষ্টতা হারিয়ে ফেলবার কোনো নির্দেশ নেই তার–না সমাজ না সময় না নিজের সংহত ভাবপ্রতিভার কাছ থেকে; কিংবা তার ব্যক্তিস্বরূপের কাছ থেকে—যা আজকের

জিনিস নয় শুধু, মানুষকে মানুষের নিঃশেষে বুঝবার ও বোঝাবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ভিতর থেকে যার জন্ম।" অন্যদিকে "কিন্তু তাই বলে কবিতার মানে পাঠকসমাজে নির্বিশেষে বিমুক্ত করতে গিয়ে যে যুগে ও যে দেশে আমি রয়েছি সেখানকার মানুষের মুখের ভাষায় কবিতা লিখুক-এ রকম বা যে কোনো রকম সংকল্পে কবিতা উতরায় না, সংকল্পের সঙ্গে কবিতার কোনো সংশ্রব নেই বলে নয়, সংস্পর্শ রয়েছে; সার্থক কবিতা হয়তো মুখের ভাষায়ই ফুটে উঠবে, কিংবা ঠিক মুখের ভাষা নয় এমনি কোনো ভাষায়; কিন্তু কোনো বিশেষ বাগরীতিতে বা অর্থে লেখা উচিত-এই সংকল্পের ভিতর থেকে নয়।" (মাত্রাচেতনা, ১৩৫১)। জীবনানন্দের গদ্যে লেখা কাব্যালোচনার সম্ভবত আদি নির্দশন বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থ নিয়ে তাঁর কিছু মন্তব্য (কবিতা, পৌষ ১৩৪৪), আর সেখানেই দেখা গেছে কাব্যভাষা সম্বন্ধে আধুনিক কবির নানামুখী পরীক্ষা সম্বন্ধে একই সঙ্গে সতর্কবাণী ও সাধুবাদ— "কোনো-কোনো কবিতায় জায়গায়-জায়গায় লঘু আমোদের ছোঁয়াচে রয়েছে, কিংবা একেবারে মুখের ভাষায় প্রতিদিনকার জীবনের নানা রকম ভাঁজ আবিষ্কার করবার চেষ্টা আছে। কবিতায় সরল মৌখিক ভাষার এ-রকম ব্যবহার 'প্রগতি' পত্রিকার যুগ থেকে শুরু হয়েছে বলে মনে হয় এবং বুদ্ধদেব এর একজন বড় propagandist। কিন্তু এ-চেষ্টা সব সময় সম্যকভাবে উৎরেছে বলে মনে হয় না। 'মধ্যবর্তী, 'কোনো মেয়ের প্রতি,' 'অন্য কোনো মেয়ের প্রতি' ঠিক কবিতা হয়েছে বলে মনে হয় না। জীবনের ঠিক এই রকম সাদা খুঁটিনাটি ব্যাপার মৌখিক সোজা ভাষায় ফুটিয়ে কবিতায় রূপায়িত করবার মত প্রশংসনীয় শক্তির আস্বাদ পেলাম 'কঙ্কাবতী'র ভিতর। আমার মনে হয় এ দিকে আরো পরীক্ষা করে দেখবার অবসর আছে এবং বুদ্ধদেব নিজেও তা করতে পারেন। যদি প্রশস্ততরভাবে সফল হন বাংলা কবিতায় একটা নতুন জিনিস দিতে পারবেন।" অবশ্য শেষ কথা বোধ হয়-মাত্রাচেতনা-" যার অভাবে আধুনিক অনেক কবিতা ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে।" মুখের ভাষা আর কবিতার ভাষা,-ঠিক এই রকম সরল বিভাজন রেখা সম্ভব নয়। অন্তত জীবনানন্দ মুখের ভাষা থেকে শব্দ যথেচ্ছভাবে নিলেও কবিতার ভাষা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ধারণাই পোষণ করতেন।

কবিতায় 'ভাষার প্রসাদ'-এর সঙ্গে 'সুরসাম্য'-এর কথাও বলেছেন জীবনানন্দ। কবিতার ভাষা নিয়ে যেমন, তেমনি ছন্দ নিয়েও তাঁর ভাবনার পরিচয় মেলে একাধিক প্রবন্ধে, যার মূল কথা হলো— "কাব্যের ছন্দ তো অনেকরকম; গদ্যও তো একরকম ছন্দ। কবি যখন ভাবাক্রান্ত হন তখন চোখ তাঁর ছবি দেখে, কান শোনে ছন্দ এবং চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিদ্যুৎ; কোন্ ছন্দে কবিতাটি রচিত হবে মুহূর্তের ভিতরেই নির্ণীত হয়ে যায় অনেক সময়; কারণ যে কোনো

আবেগ যে কোনো ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না, কবিপ্রেরণার তারতম্য অনুসারে ছন্দের জাতি-নির্ণয় হয়।" (কবিতার আত্মা ও শরীর, ১৩৫৪) রবীন্দ্রনাথ এবং সম্প্রতিকালের অনেক কবির মতো জীবনানন্দও স্বরবৃত্ত (দলবৃত্ত) তথা প্রাকৃত বাংলা ছন্দের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন, কিন্তু তার সীমাবদ্ধতাও তিনি জানতেন। কবিতা লেখার সময় স্বরবৃত্ত ছন্দের সুনির্দিষ্ট রূপাবয়ব তাঁকে তেমন আকর্ষণ করেনি। যদিও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি করেছেন। ছন্দে ভাবের প্রবহমানতা অপরিহার্য বিবেচনা করেছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর দাবি সত্ত্বেও মাত্রাবৃত্ত (কলাবৃত্ত) মুক্তকের উদাহরণ বাংলা কবিতায় বেশি নেই, তা তিনি জানতেন। অবশ্য তত্ত্বগতভাবে তাঁর মনে হয়েছে মুক্তক-স্বরবৃত্ত বা মুক্তক-মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে সহায়ক হতে পারে, আর তাই এ 'যুগের নাড়ী-মূলের নির্দেশ' দানে এর প্রয়োগ প্রত্যাশিত। কিন্তু এ কালের আরও অনেক কবির মতো জীবনানন্দ অক্ষরবৃত্ত ছন্দ (মিশ্রবৃত্ত) ব্যবহারেই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন বেশি, "আমার তো মনে হয় আজকের শ্রেষ্ঠতর বাঙালী কবিরা পয়ারকে (অক্ষরবৃত্ত/মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে) স্বচ্ছন্দে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যত বেশি গ্রহণ করেছেন, এমন আর কোনো ছন্দকে নয়।"[২]

'গদ্যও তো একরকম ছন্দ' –একাধিকবার কথাটি ঠিক এই ভাষাতেই জীবনানন্দের প্রবন্ধে আমরা পেয়েছি। জীবনানন্দের গদ্যরচনায় ছন্দস্পন্দন অনুভব করা কঠিন নয়। কিন্তু কবিতায় গদ্যছন্দের তথা গদ্যকবিতার উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি যেন কিছুটা সন্দিহান, (হয়তো তার একটা কারণ, কবিতা তাঁর কাছে 'অবিস্মরণীয় বাণী' আর অনেক সময়ই 'নিছক গদ্যে পর্যবসিত এবং স্মরণীয় নিশ্চয়ই' এমন উক্তিকে কেউ কেউ কবিতা বলে দাবি করেন)। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেন, "গদ্যকবিতা জলস্তম্ভের মতো–মেঘের মতো নয়। দূরবীনমুক্ত সেই দুরারোহ পক্ষসঞ্চার–একেবারে পূষণের নিকটে যেন–মেঘের শকুন্তরাশির; সে পাবে না কোনোদিন; একজন মিলটনকে পাবে না; একজন ব্রিজেসকেও না। এ সব কথা বলা বাহুল্য, স্রষ্টামাত্রই তা জানেন। গদ্যকবিতা পায়দল-কিংবা ঠিক বলতে গেলে পথচারী দার্শনিক ঃ শ্লেষাত্মক, সমাজ-ও-জাতি সংস্কারের দিকে যার মন সবচেয়ে আগে। কিংবা হয়তো ছিন্নপক্ষ প্রেমিক; সে ও এক নবীন অভিপ্রেত আস্বাদ।" সংখ্যায় কম হলেও জীবনানন্দ গদ্যকবিতা লেখেননি তা নয়। কিন্তু কবি-প্রেরণার তাগিদে তাঁর মনে হয় গদ্যকবিতা অল্পই লেখা হয়। গদ্যকবিতায় বৈদগ্ধ্যের চমৎকারিত্ব আছে, কিন্তু তাকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বা যথার্থ কবিতা বলে মেনে নিতে পারেন না। সমর সেনের কবিতা তাই তাঁর কাছে— "স্মরণযোগ্য বাক্যের সমষ্টিমাত্র–জীবন-সমালোচক এখানে হয়তো নিরেট সাংবাদিকতার দেয়াল টপকে যেতে পেরেছেন

কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে ভাবপ্রতিভাকে শুদ্ধ করে নিয়ে তেমন কোনো জীবনদর্শন সৃষ্টি করতে পারেননি ; যাকে কবিতা বলতে পারা যায়।" (উত্তররৈবিক বাংলা কবিতা)। অন্যদিকে বাংলা গদ্যকবিতায় কবির স্বাতন্ত্র্য যেন তেমনভাবে ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রপ্রভাব সেখানে অনস্বীকার্য। যেখানে কবির স্বকীয়তা, সেখানেও "এরা সকলেই যেন এক-ভিড় চীনেম্যান নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে একই পরিধিরি দিকে একবার না তাকিয়ে সরছে না। একই মুখাবয়ববিশিষ্ট। "অবশ্য সেই সঙ্গে "স্থিরভাবে তাকালে বুঝতে পারা যায় যে একটি চীনেম্যানের মুখের সঙ্গে আর একটি চৈনিক মুখেরও পার্থক্য -অনুদার নয়।" তবু গদ্যকবিতা সম্বন্ধে সংশয় যায় না। কবিতায় জীবনানন্দ দিব্যানুভূতি প্রত্যক্ষ করেন। মনে হয় গদ্যকবিতায় তারই অভাব। অন্তত চল্লিশের দশকের সূচনায় তাঁর মনে হয়, সে সময়ের নতুন কবিদের "মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এই জন্যেই বিভিন্ন যে এঁরা সাহিত্যে কল্পনাপ্রতিভার দাবি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে অকাতর ভাবে মননজীবী এবং কবিতায় বিশুদ্ধ রসের কোনোরকম অবতারণার বিরোধী। আধুনিক বাংলা কবিতায় এই সব কবিই গদ্যপ্রায় পদ্যছন্দ অথবা গদ্যছন্দ অবলম্বন করে চলেছেন–এবং বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার শববাহনের কাজ চলেছে এঁদের কবিতায়। কিন্তু এসব লেখায় কোনো নতুন আশা ও দীপ্তির পরিচয় পাওয়া গেলে এ হেন আধুনিক বাংলা কবিতার উপকার হত–সে পরিচয় তাঁদের আঙ্গিকে সঞ্চারিত হলে পদ্য বা গদ্য শরীরেও কবিতার জন্ম হত–আশা করা যায়।" (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা)। গদ্যকবিতা নিয়ে এই আপত্তি কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এমনকি সে কালে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গদ্যকবিতা নিয়ে যাঁরা বিরূপ মন্তব্য করতেন তাঁদের সঙ্গে মতৈক্যের পরিচয়ও নয়। জীবনানন্দ কবি ও কবিতা সম্বন্ধে যে-বিশিষ্ট ধারণা পোষণ করতেন তার সঙ্গে ছন্দভাবনাকে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

টীকা

১. অলোক রায়, জীবানন্দের কাব্যদর্শ ; সন্দীপ দত্ত সম্পাদিত জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী, ১৩৯০, পৃ. ৪০–৪৭।

২. জীবনানন্দের ছন্দভাবনা ও তাঁর কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনার জন্য ড. অলোক রায়, নির্মুক্ত সমুদ্র ; তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ জিজ্ঞাসা, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৫-৩৯।